KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫ আশ্বিন ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ চৈত্র ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।*

—:০:—

কলিকাতা, ৯ই অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষত ভরা শ্রাবণে, এক একটা বাদলার দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি ঝরছে, কোথাও কোনখানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে সুস্থ সবল মানুষের জীবনও দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে, চারিদিক ভিজে স্যাঁত স্যাঁত করছে—আকাশে মেঘের ভার যে কখন হাল্কা হয়ে যাবে, তার কোন সুদূর লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ আমার মনে কত দিনের কত পুরাণ সুখের কথা ভিড় করে আসছে। মানুষ কত কি ভুলে যায়, কিন্তু "পুরাণো সে দিনের কথা" ভোলা হয়ে ওঠে না! ছ'বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শীকার করতে নিয়ে গিয়ে তোমায় মৃগয়া-ব্রতে দীক্ষিত করব, কথা আছে। আমার এই অঙ্গীকার বার বার তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দাও। যখন আমার বয়স নাবালকের গণ্ডী পেরোয় নি, সবে সতের কি আঠার, সেই সময়, আমি আমার প্রথম চিতাবাঘ শীকার করি! "চিতা"

* শ্রীমতী শ্রিদ্বদা দেবী কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত "Sport in Jheel and Jungle" নামক ইংরাজী শীকার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

বলে মনে কোরনা সেটি ছোট্ট—তার রাক্ষসপ্রমাণ শরীর। রামায়ণে দুন্দুভি রাক্ষসের হাড়ের বর্ণনা পড়েছ ত? এই বাঘের চামড়া না নিয়ে, হাড় যদি নেওয়া হত, তাহলে হয়ত তার পরিমাণ, দুন্দুভির হাড়কেও হার মানাত। একরাশ কটাশে রোঁয়া, জন্তুটি এত কাছে এসে পড়েছিল যে, অতটা সান্নিধ্য কখনই নিরাপদ নয়! কিন্তু না জানা থাকলে, অনেক ভয়ানক জিনিসও ভয় দেখাতে পারে না। ভাগ্যে, তাক্ ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফরসা,—তারপর তার পিছন পিছন দৌড় দিলাম! আহত বন্য জন্তুকে এমন ভাবে তাড়া করে যাওয়া শীকারের সব আইনের বিরুদ্ধ; বিশেষত এদের চালচলন সবই যখন আমার অজানা। তবে "সব ভাল যার শেষ ভাল",—জয়ী আমিই হলাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে ঘরে বসে বসে সে দিনের পাগলামির কথা নতুন করে মনে পড়ছে। সে দিনের সেই অপূর্ব্ব আনন্দ, আজকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়েছে—শুধু সে একা আসে নি, অনেক সাথীও সঙ্গে এনেছে। নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, বড় বড় জানোয়ার যা-কিছু শীকার করেছি, তা পায়ে হেঁটেই করেছি। এতে বিপদের খুবই সম্ভাবনা, তবু আমি জোর করে বলতে পারি এই পন্থাই সব চেয়ে নিরাপদ। যদি এদের ধরণ-ধারণ, মেজাজ ও খেয়াল সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছু পিছু খুঁজতে যাবার, পায়ের দাগ দেখে খুঁজে বার করবার কায়দা কিছু না জান, কিম্বা কষ্ট স্বীকার করে এ বিদ্যা আয়ত্ত না করে থাক, তাহলে সুবিধার চেয়ে বিভ্রাট ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে এ বিদ্যা বই পড়ে পাওয়া যায় না, হাতে-বন্দুকে-বল্লমে শিখতে হয়। তা যদি

শিখতে পার, আর এ পথে চলবার জন্যে একজন যোগ্য সঙ্গী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, তাহলে দেখবে, মৃগয়া তোমার ব্যসন না হয়ে আনন্দের উপকরণ হবে, শীকারের খেয়াল বজায় রাখতে গিয়ে দুঃখে পড়বে না। এ বিষয়ে তোমায় অনেক কল-কৌশল শিখিয়ে দিতে পারব। চারদিকের সব অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে, চর্চ্চার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাড়ে তাতে আর সন্দেহ কি? আজকালকার দিনে ছেলেদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের অনেক বিধিদত্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবনতি হয়। এই কথা মনে করেই, সর্ব্বদা যে-সব জীবজন্তু পাখী দেখতে পাও, তোমার মনে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্যে আমি বিশেষ চেষ্টা করে আসছি। তুমি আর ছোট্ট অলকা, (যদিও তুমি মনে কর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকারই নেই) অনেকবার হাতির উপর চড়ে স্নাইপ (Snipe) শীকার দেখেছ। যখনি ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে চলেছে, পাখীটি উড়েছে, আমি মারতে যাচ্ছি, অমনি ছেলেবয়সের অদম্য উৎসাহে চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছ! তোমরা এখন জান, স্নাইপ কত অল্প সময়ের জন্যে বাঙলা দেশে বেড়াতে আসে। তাদের লম্বা ঠোঁটের পাশে, (চোখের পাশে নয়) কান যেখানটিতে থাকে, সেই সংস্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর থেকে, আমার কথা ঠিক কি না, বার বার তার পরখ করে নিয়েছ। আমি যতদূর জানি বুনো মোরগ হচ্ছে আর একমাত্র পাখী, যার এই বিশেষত্ব আছে। এ তত্ত্ব তোমাদের

এখনও জানতে বাকী আছে। কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাত এদের বেশী পছন্দ। তাই বোধহয় শীগ্‌গিরই পৌঁছবে, তোমরা সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে কার ছুঁচের মত লেজ আর কার পাখার মত লেজ, সে প্রভেদ চিনতে তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তোমাদের কাঁচা বয়সের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে, এ প্রভেদ অনায়াসেই ধরা পড়বে। একটি প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সে প্রভেদটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্বামী স্ত্রীকে এক চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু তাও কি কখনো হয়? আর এক কথা, এই পাখীর বরক'নের মধ্যে এমনি ভাব যে, একেবারে মাণিক-জোড়। পুরুষ ধরা পড়লে মেয়েটিও ধরা দেয়; কাজেই আমি যখন শীকারে যাব, তখন তোমরা দুই ভাই বোনে দুটি পেতে পারবে। এদের সংখ্যা বেশী নয়, আর আমার বংশবৃদ্ধির অনুপাতে, তাদের নম্বর ঠিক রেখে গ্রেপ্তার করে আনবার সাধ্য হচ্ছে না। তাই এবারে প্রথম যেটি ধরা পড়বে, সেটি আমাদের বাড়ীর ছোট-লাটসাহেব ওরফে কালীবাবুকে নজর দিতে হবে, তা নাহলে তিনি নিশ্চয়ই মানহানির দাবীতে মহারাণীর দরবারে নালিশ রুজু করবেন, তখন আমার অবস্থা যে কি হবে, তা তোমরা বেশ আন্দাজ করতে পারছ।

স্নাইপ, আর স্নাইপ শীকারের কথা এখন বেশী বলব না। আমাদের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ীর আঙিনা হতে, অনেক সন্ধ্যায় তোমরা চিতাবাঘের করাত-চলার মত আওয়াজ শুনেছ—আর যতদিন না আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন আর সে শব্দের বিরাম হয় নি। তোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শীকার করতে যাই, তখন আমার বসবার টুলের সম্মুখে পাতায় ভরা ডালপালা দিয়ে একটা

আড়াল করে নিই। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিম্বা মজবুত নয়, তবু নিজেকে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা মোহনলাল হাতিতে চড়ে বাঘের যাওয়া-আসার গলিপথ আবিষ্কার করে ফিরবার আগেই কতবার হয়ত বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছ, তারপর তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেখেছ মস্ত একটা চিতাবাঘ ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে—গুলি একেবারে তার গলার নলি ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমাকে শীকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে লেখা ছিল অন্য কথা, তাই তার মনের সাধ পোরবার আগেই সে লুটিয়ে পড়ল, আর যম-রাজা তার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। জানত যমের বাহন মহিষ, জীয়ন্ত থাকলে ব্যাঘ্রবীর মহিষটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পিছ-পা হত না বোধ হয়। যাই হোক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের মত লক্ষ্য-বেধ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার সুবিধা হয়ে গেল, তা নাহলে বাহনটি মারা গেলে ভদ্রলোকের চলা-ফেরার মুস্কিল হ'ত!

হরিপুরের চারদিকেই বুনো-শূয়োরের বসতি, পাবনার বুনো-শূয়োর তার বিপুল বপুর জন্যে বিখ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে লোভে চারিদিকে ফেরে, আর সুবিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের হত্যা করে উদর পূরিয়ে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। বনের ভিতরে যে সব গলিপথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়; তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। আমি তোমাকে এ বিষয়ে আজ যা বলে দেব, তাতে কাল তোমার জ্ঞানলাভের সুযোগ হতে পারে। আর তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে নির্ব্বিঘ্নে তুমি বেশ শীকার করতে

পারবে। আমরা যে শুনতে পাই, শীকার করতে গিয়ে অমুক লোকটা হঠাৎ মারা গিয়েছে, কিম্বা ঘায়েল হয়েছে, এ সব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ তো নয়ই! মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিম্বা দুঃসাহসিকতা,—চল্‌তি কথায় যাকে বলে বোকামি আর গোঁয়ারতমি!

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক, তাই সাহস আর বুদ্ধি দু'য়েরি বিশেষ দরকার। তা না হলে, এ খেলায় কোন আমোদই থাকত না!

"No game was ever yet worth a rap
For a rational man to play,
Into which no accident, no mishap
Could possibly find its way."

আমি তোমাকে এখন যে সব চিঠি লিখছি, তা হতে তুমি প্রথম যেদিন বন্দুক হাতে শীকারক্ষেত্রে নামবে, সেদিন অনেক দরকারী জিনিস তোমার জানা থাকবে, অন্তত থাকা উচিত। আর তুমি যদি পাকা হুসিয়ার শীকারী হতে না পার, তার জন্যে আমি দায়ী হব না। শুধু পশুপাখীর প্রাণহানি করবার ক্ষমতা দক্ষ শীকারীর পরিচয় নয়। ইংরাজীতে যাকে gentleman বলে, তার ঠিক প্রতিশব্দটি আমাদের বাঙলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তবু কথায় না বলতে পারলেও ভাবটি যে কি তা আমরা সবাই বুঝি। আমার মতে যে লোক জীবনের সব ব্যাপারেই যথার্থ gentleman, সেই ঠিক চৌকোষ শীকারী (sportsman). জীবনটা ত সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষ

করে আমাদের ভারতবাসীদের জীবনের আশেপাশে চারিদিকেই কত বাধাবিপত্তি। শীকার করতে গিয়েও দেখবে সেখানে কত ঈর্ষা বিদ্বেষ, কত ক্ষুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ ভদ্রতাবিরোধী কত হীন ব্যবহার, এক কথায় বলতে গেলে কত অভদ্রতা বিরাজ করছে।

তোমার বয়সী ছেলেদের মধ্যে, বোধহয় তোমার মত মহাভারতের কথা আর কেউ অত ভাল করে জানে না, তাই তুমি জীবনে কি ভাবে চলতে পারবে, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ কোন দ্বিধাই নেই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, তার অর্থ তোমার মনে ভাল করে বসিয়ে দিতে চাই,—সে হচ্ছে "you must play the game"—অর্থাৎ খেলার নিয়ম মেনে খেলা চাই। চেনা ব্রাহ্মণের যেমন পৈতার দরকার হয় না, তেমনি ভাল খেলওয়াড়, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তার হাতে চলে ভাল। এই যে জর্ম্মান-ইংরাজে যুদ্ধ হচ্ছে, এতে খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভালো sportsman-রাই সব চেয়ে ভাল যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তার অনেক গুণই তারা মৃগয়া-ক্ষেত্রে অর্জ্জন করেছিল। এই বিপুল সমরাভিনয়ের নান্দী মৃগয়াতেই হয়েছিল। ফুটবলের হুড়োহুড়িতেও তুমি খুব মজবুত, তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সতর্ক। এই দুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক রাখবার ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শরীর সবল, অস্থি মজ্জা পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পুরুষের যা পৌরুষ, তারি সূচনা হয়। ইংরাজের বাচ্চার মধ্যে, এই যে খেলার উৎসাহ, আগ্রহ আর একাগ্রতা আছে, ইহাই পরে তাকে জীবনের ঝড়ঝাপটায় তরিয়ে দেয়, আর যুদ্ধের এই সঙীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছে।

এই নৈপুণ্য, সাবধানতা, ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, আজকার সংগ্রামের প্রাণান্ত পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুলের ছাত্রদের যে কত বড় আর কেমন অটল সহায় হয়েছে, তা আর আমি তোমায় কি বলব? বৃহত্তর জীবনসংগ্রামেও এই সুকৃতির ফলে, তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যেই আমি তোমাকে আর তোমার ছোট ভাইটিকে বোঝাতে চাই যে, রাজার আর স্বদেশের সম্মানরক্ষার জন্যে যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে সে মহৎ কর্ত্তব্যের আরম্ভ করতে হবে এই খেলার আখড়ায়, শৈশবের এই খেলাঘরে। একদিন আমার জীবনেও এই আকাঙ্খা জাগ্রত ছিল; বৎসরের পর বৎসর চলে গেল, কামনা আর কর্ম্মে পরিণত হল না। এখন সে স্বপ্ন আর আমার আশার রাজ্যে নেই, ক্রমশ স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমরা আমার জীবনে এসেছ, তাই আশা আবার দেখা দিয়েছে, আমাকে দিয়ে যা হয়নি, তোমরা তা করবে। যতক্ষণ না অনুভব কর যে তোমারি দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়তার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে, যতক্ষণ না তুমি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এই বিশাল রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে পাশাপাশি ও সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পার, ততক্ষণ যথার্থ স্বদেশভক্তি তোমার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তোমাদের এই শক্তিতে প্রাণবান আর এই যোগ্যতার অধিকারী হ'তে দেখাই এখন আমার জীবনের পরম আকাঙ্খা, তাই আমি চাই, সংসারের এই রঙ্গভূমিতে সব রকমে তোমরা হুসিয়ার খেলোয়াড় আর মজবুত পালোয়ান হবে।

এ চিঠি শেষ করবার আগে, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বসুন্ধরা তাঁর প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সুমুখে

দিনরাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভালো পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না, পড়ে শেষও করা যায় না। রোজই নতুন কথা লিখছেন, একঘেয়ে হয় না বলেই বুঝি এমন ভাল লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে ঘুপ্‌সি হয়ে বসে আপন খেয়ালমত চলেন,—অনেক সময় ভুল করে' চশমাটা যে চোখে পরবার নয়, তাতেই লাগান, তাই যা সত্যি, তা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন তার উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু মাঠে বনে যাঁরা প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে ফেরেন, তাঁরাই ঠিক খবরটি পান। সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখো, আর যা দেখলে তা মনে রেখো। যে সব জন্তু শীকার করা হয়, শুধু তাদের রীত-চরিত নয়, সব জন্তুরি অভ্যাস ব্যবহার ভারী আশ্চর্য্য। পাখীদের সম্বন্ধে একই কথা খাটে।—যখন শীকারের খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, বসে বসে দিন আর কাটে না, তখন যদি চারদিকের অপরাপর জন্তুদের চলাফেরা লক্ষ্য করবার অভ্যাস তোমার থাকে, তাহলে থিয়েটার দেখতে দেখতে মানুষের যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, তেমনি তোমারও দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল তা বুঝতেও পারবে না।

কৃষিকাজ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গল যত কাটা পড়ে যাচ্ছে, শীকারও তেমনি অল্প হয়ে আসছে। যে সব সুবিধা আমরা পেয়েছি, সে সুযোগ তোমরা খুব সম্ভবত পাবে না। খাল বিল শুকিয়ে আসছে—নদীর ধারার সে প্রবল স্রোত আর নেই; এর প্রধান কারণ দেশের বড় বড় বন কাটা পড়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। এ বিষয় বেশী জোর করে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই, তবে শীকার

যে কমে আসছে, সেটা এমন প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। যে সব দেশে আগে বুনো-মোষ আর হরিণ দলে দলে চরে বেড়াত, এখন আর তাদের সেখানে দেখা যায় না, তারা অন্যত্র চলে গেছে, তাদের খুঁজে খুঁজে বাঘ ভালুকও দেশান্তরী হয়েছে। সেই জন্যে তোমাকেও হয়ত অনেক দূর দেশে যাত্রা করতে হলে, তবে যাত্রা যে নিষ্ফল হবে এমন কথা বলা যায় না। যা' চাও তা' পাবার জন্যে বহু ধৈর্য্যের আবশ্যক। জীবজন্তুর জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু জ্ঞান সঞ্চয় করে নিয়ো। খাল, বিল, নদী, নালা, মাঠ, বন, পাহাড় পর্ব্বত মানুষের মন ভোলাবার অনেক ফন্দী জানে, এত আনন্দ দিতে পারে যা জীবনেও ফুরোয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে: এই যে পশু পাখার গায়ের রং, এ যে কেন এমন, এ রহস্য ভেদ করবার আগে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়, অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক। শুনতে পাই সূর্য্যের আলো বনের রাশি রাশি পাতার মধ্যে দিয়ে গোল হয়ে আসে, আর যেখানে গাছপালা ছাড়া ছাড়া, পাতার মধ্যে অনেক খানি করে ফাঁক, সেখানে লম্বা হয়ে পড়ে। এই জন্যে চিতার গায়ে গুল বসান, আর বাঘের গায়ে ডোরা কাটা। একজন থাকেন গভীর বনে, আর একজন বনের ধারে; এমনি পোষাক পরেন বলেই অলক্ষ্যে শীকারের উপর গিয়ে পড়তে পারেন। তৃণজীবি জন্তুদের গায়ের রং তাদের বাসস্থানের সঙ্গে এমনি মিশ খায় এবং পর্দ্দার মত আড়াল করে ঢেকে রাখে যে, শত্রুর চোখ সহসা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এটা কি একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর আর নড়চড় হয় না?—হয় বৈকি, বহুশত্রুবেষ্টিত একই জায়গায় হয়ত ঝলমলে পোষাকপরা অনেক পশুপাখী দেখা যায়—যাদের রং দূর হতেই

চোখে পড়ে। ঋতুপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখীর গায়ের স্বাভাবিক রং আবার বদলাতেও দেখা যায়। যে দেশে শত্রুর সংখ্যা কম, সেখানে তাদের সাজপোষাকের জাঁক-জমক বেড়ে ওঠে। যেমন আজকাল যুদ্ধের দিনে খাকি পরা হয়েছে, শান্তির দিনে সেপাইরা রক্তের মত রাঙা পোষাক পরে' বেড়াত। দেশভেদে আর বিয়ের মতলবেও পশুপাখীরা রং বদলায়। যেমন বুড়ো-বর গোঁপে চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা ছেলে সেজে মন ভোলাতে চায়, তেমনি আর কি! আমি তোমাকে গোড়ার কথা দু' একটা বলে দিতে পারি, কিন্তু এগোতে হলে সাবধান হয়ে দেখতে হবে, সতর্ক হয়ে বিচার করা চাই, তবে ত প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করতে পারবে।

---

(২)

কলিকাতা, ১২ই অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা,

প্রথম চিঠিখানিতে উঁকি দিয়েই বুঝেছ সেখানি তোমার ভাই কল্যাণকে লেখা হয়েছে, এই দেখেই তোমার পুটপুটে রাঙা ঠোঁট দু'খানি একটু ফুলে উঠল, তার অর্থ—এ চিঠি ত দু'জনকেই লেখা যেতে পারত। কল্যাণকে আরণ্যবিদ্যা শেখান আর তোমাকে আমার শীকারের গল্প শোনান, এক ঢিলে দুই পাখীই শীকার করা চলত। কয়েক বৎসর পরেই তোমাকে আমাদের হিন্দুজীবনের যোগ্য গৃহ-লক্ষ্মীর কাজ করতে হবে। এ সাধ তোমার মনে হয়ত একটু আধটু আছে, আর তা ছাড়া, আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের সাহায্যে এই সহজ সরল ইচ্ছাটি বিকৃত না হয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। আজ-কালকার দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এড়ান বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু সুদূর ইউরোপে তোমার বিদেশিনী বোনেদের জীবন যে বড় সুখে কাটে তা নয়, বরং অনেকেরি জীবন বৃথা কাজে ব্যর্থ হয়ে যায়। অনেককেই আবার নতুন করে শেখাতে হয় যে, স্ত্রী হওয়া, ছেলের মা হওয়াই সচরাচর নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ আর পূর্ণতা। আগে যে-পথে শুধু পুরুষরাই যাত্রা করতেন, এখন কালের গতিকে সেখান-কার মেয়েদের জন্যেও সেই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভাবে, যে সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা এই নতুন পথের যাত্রী হয়েছেন, বিপদের মুখে তাঁরা যে নির্ভীকতা অথচ নারী-সুলভ সৌকুমার্য্য

ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আশ্চর্য্য না হয়ে, তাঁদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কিন্তু তবুও সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করে' সুখী হলেও, স্ত্রীলোকের সবখানি মন যে এতে ভরে না, সে কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। পুরুষের যদি জীবনসঙ্গীর আবশ্যক থাকে, স্ত্রীলোকের আবশ্যক যে তার চেয়েও অধিক, তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের অঙ্গ, সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি একেকই সমাজের অংশ। আমাদের দেশে ইতিহাসের সুদূর অতীত আবার এতই সুদূর যে, তার অনেকখানি আমাদের চোখে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি যে, পরিবারই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, তার ধ্রুব পদ। স্ত্রীলোকেরা শুধু যে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছেন তা নয়, তাঁদেরি যত্নে, তাঁদেরি প্রভাবে, আমরা কখনো বর্ব্বরতার ক্ষেত্রে পা বাড়াতে পারি নি। গৃহখানিকে সুন্দর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রাখা, জীবনের আদর্শ উন্নত পবিত্র রাখা, গৃহ বলতে যে আনন্দধাম আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাকে চিরস্থায়ী করা,—এই কর্ত্তব্যই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্ত্তব্য; এর কাছে বিদেশী অনুকরণে "ফ্যাসানেবল" (fashionable) রমণীর জীবন কত তুচ্ছ, কি পর্য্যন্ত শ্রীহীন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। এই নতুন জীবনের স্রোত ক্ষীণ-ধারায় এ দেশেও এসে পৌঁছেছে—তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না সত্যি, তবু সাবধান করে দেওয়ায় দোষ কি? কেননা অনেক পরিবারেই বিদেশী আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, অনেকে বিনা বিচারে এই স্রোতে গা ঢেলে দিচ্ছেন। আসল কথায় ফেরা ভাল;—এখন হতে সব চিঠিই তোমার আর কল্যাণের দু'জনের নামেই লেখা হবে। তুমি শীকারের জীবনের

আনন্দ ও বিপদ দুই-ই বোঝ, কেন যে তোমাকে তার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তা তোমাকে বলবার বেশী দরকার নেই। তোমার সব চেয়ে অনুরক্ত বৃদ্ধ ভক্তটিও এ দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হবার সম্মতি দেবেন না। যে দিন আলোয় আকাশ উজ্জ্বল, বাগানে কত রং-এরি ফুলের বাহার, নীল আকাশের গায়ে কত টিয়ে চন্দনা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমার শীকারের গল্প শুনবার জন্যে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন সে গল্প করতে আমার মনে যে গৌরব অনুভব করি, তা আর কারো কাছে হয়ত ছেলেমানষি বলে বোধ হতে পারে—তা হ'ক। সেই পুরাণ গল্পই আমি আজ আবার তোমাদের নতুন করে বলছি।

(ক্রমশ)

আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা।*

—:০:—

এ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধে আজ এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—সে বিষয়ের আমি ব্যবসায়ী নই। ছেলে-পড়ানো এবং স্কুল-চালানো সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। প্রথমত আমি কখনও স্কুলমাষ্টারি করি নি; তার পর আমি নিজে নিঃসন্তান, সুতরাং ঘরেও কোন ছেলের শিক্ষার ভার আমাকে নিজের হাতে নিতে হয় নি; এবং অবস্থার গুণে পরের ছেলেরও প্রাইভেট-টিউটরি আমাকে কস্মিনকালে করতে হয় নি। এ সব কারণে যদি কেউ বলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কথা কওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা, তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে দর্শকের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে, যা যাঁরা কোনও বিশেষ কর্ম্মে একান্ত ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। এ সত্যের পরিচয় দাবা খেলায় নিত্যই পাওয়া যায়। পাকা খেলোয়াড়েরাও আনাড়ির উপরচাল অনেক সময়ে গ্রাহ্য করেন। আমি শিক্ষা বিষয়ে পরের ছেলের উপর কখনো কোনও experiment করি নি—কিন্তু বহুকাল থেকে মনোযোগ সহকারে

* বালিগঞ্জ জগবন্ধু বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

সঃ সঃ।

সে experiment এর পদ্ধতি এবং ফলাফল observe করে আসছি। সেই নির্লিপ্ত observation-এর ফলে আমার মনে শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং কতকটা সেই বিশ্বাসের বলে এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি।

এ সাহসের অন্য কারণও আছে। আমি একটি বিশেষ ছাত্রকে খুব ভালরকমই জানি, এবং সে ছাত্র হচ্ছেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। আমি বহুকাল পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছি, কিন্তু অদ্যাবধি বিদ্যার্থীই রয়ে গিয়েছি। এই বিদ্যার্থীটির শিক্ষার ভার আমি পঠদ্দশাতেই অনেকপরিমাণে নিজের হাতে নিই,—তার পর থেকে যিনি ছাত্র তিনিই তার গুরু হয়েছেন। এ সূত্রেও গুরুগিরির সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার কতকটা জ্ঞানলাভ হয়েছে। তাই বলে অবশ্য এ ভুল আমি কখনও করে বসি নি যে, শিক্ষার যে পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উপযোগী, সেই পদ্ধতি সকলের পক্ষে সমান উপযোগী। জ্ঞানের ক্ষুধাও সকলের মনে সমান নয়, তারপর এ বিষয়ে মানুষের রুচিও বিভিন্ন, অধীত-বিদ্যা জীর্ণ করবার শক্তিও কমবেশ। শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে কতদূর সঙ্কীর্ণ ও অশাস্ত্রীয়,—সেই জ্ঞান আমার ছিল বলে, আমি ইউরোপের নব-শিক্ষা-শাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করেছি।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সকল দেশেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে নানারূপ মতভেদ আছে। মানুষের মন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে

সকলের পক্ষে একমত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব; তা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষাচার্য্য ও দার্শনিকদের বহুদিনের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষারও একটি Science এবং Art ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌ছে। এ শাস্ত্রকে Science নামে অভিহিত করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কেননা ছেলেদের মন ও দেহ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এমন কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করেছেন যা, দেশকালনির্ব্বিচারে বালকমাত্রেরই সম্বন্ধে সমান সত্য। এবং এই সত্যের উপরেই শিক্ষার নব-পদ্ধতি গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষার এই নব আর্টের সার্থকতা হচ্ছে এই যে, এ আর্টের জ্ঞান থাকলে শিক্ষকেরা ভুল পথে যান না। অর্থাৎ তাঁরা এর সাহায্যে ছেলেদের সুশিক্ষা দিতে পারুন আর নাই পারুন—কুশিক্ষা দেন না। এও একটা কম লাভের কথা নয়। সুচিকিৎসার গুণে রোগী রক্ষা পাক্ আর না পাক্, কুচিকিৎসার ফলে সে বেচারা মারা যায়। এই শিক্ষা-শাস্ত্রের চর্চ্চা করলে স্কুলমাষ্টারেরা আর হাতুড়ে থাকেন না।

আমি আজকের সভায় এই Science এবং আর্টের আংশিক পরিচয় দেব স্থির করেছিলুম;—এই মনে করে যে, সে পরিচয় দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ব না, অর্থাৎ বিবাদের সৃষ্টি করব না। ইংরাজি ও ফরাসী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি, সে তথ্য বাঙলা করে আপনাদের কাছে নিবেদন করলে, আমি প্রথমত আত্মমত প্রকাশের দোষে দোষী হতুম না, দ্বিতীয়ত Professor James, Professor Findlay, Professor Dewey, Alfred Fouille প্রভৃতি বড় বড় মণীষীদের বাক্যাবলীতে আমার প্রবন্ধ অলঙ্কৃত করতে পারতুম; তাতে আমার প্রবন্ধের যে গৌরব বৃদ্ধি হত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, যে-কোন বিষয়েরই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে, সে আলোচনায় আমাদের রাগদ্বেষ প্রকাশ করবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং তার ফলে শ্রোতাদের অন্তরেও তাদৃশ রাগদ্বেষ আমরা উদ্রেক করি নে। আর ধর্ম্ম এবং পলিটিক্সের মত, শিক্ষাও যে এ যুগে মানুষে মানুষে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার হয়ে উঠেছে, ইউরোপের আজ একশ বৎসরের ইতিহাস পাতায় পাতায় এই অপ্রিয় সত্যের পরিচয় দেয়। বিশেষত শিক্ষার সমস্যা যখন হয় ধর্ম্ম নয় পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন সেই সমস্যা নিয়ে লোক-সমাজকে যে কি পরিমাণ উত্তেজিত করা যায়, তার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স জর্ম্মানী বেলজিয়াম ইতালি প্রভৃতি দেশে, মধ্যে মধ্যে গুলিগোলার সাহায্যে সে সমস্যার আশু মীমাংসা করা হয়েছে। আর এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষা জিনিষটে অতি সহজেই ধর্ম্ম পলিটিক্স ইকনমিক্স প্রভৃতি জাতীয় আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের দেশেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাওয়া গেছে। তখন পলিটিক্সকে মুখ্য করেই আমরা শিক্ষা-সমস্যার একটা নূতন মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে, তা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা গড়তে চেয়েছিলুম একটি নব-নালন্দ— আমাদের হাতে কিন্তু সেটি হয়ে উঠেছে একটি workshop, এ ব্যর্থতার কারণ কি ?—এর কারণ, আমরা শিক্ষাকে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যসাধনের উপায়-স্বরূপ গণ্য করায়, যথার্থ শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা করতে পারি নি। উত্তেজনার মুখে কোনও কাজ করতে গেলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট

হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়, বিশেষত সেই সকল ব্যাপারে, যে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির সহায়তা দরকার। বলা বাহুল্য লৌকিক আন্দোলনের প্রসাদে লোকের দৃষ্টি একমাত্র বর্ত্তমানের উপরেই আবদ্ধ থাকে, এবং সে অবস্থায় লোকের অন্তরে হৃদয়াবেগ, বিচারবুদ্ধির স্থান অধিকার করে।

(৩)

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-তর্ক আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম—আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে পরোক্ষভাবে সেই তর্কে যোগদান করতেই আহ্বান করেছেন। আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতা নিয়ে দেশে একটা মহা আন্দোলন চলেছে। ফলে একটা দলাদলি সৃষ্টি হবারও উপক্রম হয়েছে। এ আন্দোলনে লিপ্ত হতে হলে, এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, নচেৎ কোন পক্ষই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, দু'পক্ষই সমান নারাজ হবেন। তার ফলে কোন পক্ষই আমার কথার কিছুমাত্র দাম দিতে রাজি হবেন না। অথচ এ ক্ষেত্রে কোন একটা দিক নিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের খবর জানি নে,—না তার আয়ব্যয়ের হিসাব, না তার অধ্যাপকমণ্ডলীর গুণাগুণ। বিশ্বসরস্বতীর মন্দিরে তাঁর পূজো অথবা শ্রাদ্ধে দেশের টাকা পণ্ডিতবিদায় কিম্বা কাঙালীবিদায়ে বরবাদ হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে জজ হয়ে বসবার পক্ষে আমার একটু বিশেষ বাধা আছে। আমি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঠিকে অধ্যাপক। এ অবস্থায় আমার রায়ের নিরপেক্ষতায়

কেউ বিশ্বাস করবেন না। সে রায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটুও স্বপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি ইউনিভারসিটির নুন খাই বলে তার গুণ গাচ্ছি; আর সে রায় যদি উক্ত বিদ্যালয়ের একটুও বিপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি নিমক-হারাম। এই উভয়সঙ্কটে পড়ে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে না-ছুঁয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে দু'-চারটি সাধারণ কথা বলতে চাই।

এ কালে একটি ইউনিভারসিটি চালানো বহু ব্যয়সাধ্য—এবং ইউরোপ আমেরিকার সকল শিক্ষাচার্য্যের মতে দিনের পর দিন সে ব্যয় বেড়েই যাবে। এক উচ্চ-শিক্ষা বন্ধ করা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে ব্যয়ভার লাঘব করার উপায়ান্তর নেই। ইউনিভারসিটি কমিসনের রিপোর্ট অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি, সুতরাং তার ভিতর সাপ ব্যাঙ কি আছে, আমি কিছুই বলতে পারি নে। কিন্তু আমি ভরসা করে বলতে পারি যে, কমিসনের মতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে যথার্থ বিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে নি,তার অন্তত একটি কারণ—তার দারিদ্র্য। দরিদ্র বিদ্যালয় যে কি করে বিদ্যার খয়রাত করবে, তার হিসেব পাওয়া কঠিন।

এর উত্তরে অনেকে বলেন যে সু-গৃহিণীর কাজ হচ্ছে আয় বুঝে ব্যয় করা। আয় বাড়াবার চেষ্টা না করে ব্যয় কমাবার দিকে যত্ন করা যাঁরা সুবুদ্ধির কাজ মনে করেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা দিচ্ছেন। Post-graduate শিক্ষা ছেঁটে দেবার প্রস্তাব চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। এরূপ অস্ত্র-চিকিৎসার ফলে ইউনিভারসিটির দেহভার অবশ্য অনেকটা লাঘব হয়ে আসবে, তবে তাতে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়বে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ প্রস্তাবের

অর্থ কি জানেন?—বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তমাঙ্গ ছেদন করা। উচ্চ-শিক্ষার উচ্চতা নষ্ট করা যে সে শিক্ষার উন্নতির সদুপায়, এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না; আমার চিরকেলে বিশ্বাস এই যে, উচ্চ শিক্ষার সার্থকতা উচ্চ থেকে উত্তরোত্তর উচ্চতর হওয়ায়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই যথার্থ সুব্যবস্থা, যার ফলে সমাজের অবস্থান্তর ঘটে, যার সহায়তায় মানুষ জীবনের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। উচ্চশিক্ষা জিনিসটিকে আমরা যে এতদূর বহুমূল্য মনে করি, তার এক মাত্র কারণ—আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষার প্রসাদে মানুষ উচ্চতর জীব হয়।

আমার এ কথার উত্তরে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা ব্যয়-কুণ্ঠ নন তাঁরা বলবেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগটি আগাগোড়া ফাঁকি ও ভুয়ো। এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই, অথচ কাজে কিছু হয় না। এ বিভাগের কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অধ্যাপক আছে কিন্তু ছাত্র নেই; এবং যে সকল ক্ষেত্রে ছাত্র আছে, সে সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপকেরা নাকি একেবারেই অকর্ম্মণ্য।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারি নে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাববশত। তবে বিনা প্রমাণে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ গ্রাহ্য করে নিতে আমার মন সরে না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা শতকরা নিরনব্বই জন হচ্ছেন আমাদের স্বজাতি। তাঁদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার একদম চূর্ণ হয়ে যায়। সমাজ যদি শিক্ষকদের দুরছাই করে, তাহলে শিক্ষার কি সদ্গতি হয়? এই অধ্যাপকদের মধ্যে অন্তত এমন জনকতক যদি থাকেন, যাঁরা অধ্যাপনার কাজটি ব্রত

হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাহলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বাইবেলের সেই পাকা কথাটা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, many are called but few are chosen, এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে chosen few আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

তারপর উচ্চশিক্ষার কোন কোন বিভাগে যে ছাত্র জোটে না, সে দোষ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের না সমাজের? B. L. পড়বার জন্য হাজার হাজার ছেলে জোটে, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শেখবার জন্য যে দুই চারটির বেশি অগ্রসর হয় না, তার কারণ আমাদের মতে আইন অর্থকরী বিদ্যা; কাজেই সে বিদ্যা এতটা অনর্থকরী হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় নয়।

আসল কথা এই যে, উচ্চ শিক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার উচ্চতার উপর। এস্থলে আমি আমার দার্শনিক গুরু Professor William James-এর গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে। তিনি আমেরিকার শিক্ষকমণ্ডলীকে এই সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে বলেন যে—

"The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the State, and spreads slowly outward and downward."

ইউনিভারসিটি মাত্রেরই উদ্দেশ্য জনকতক reflective members of the State তৈরি করা, এবং তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্তও রাখা চাই।

(৪)

আমরা যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছি, সেটির আসল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত লর্ড কার্জনের University Act-এর ঠেলায় বহুদিন যাবৎ এই পথেই চলেছে। এতদিন ত কৈ আমরা এর হালচালের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করি নি। আজ কেন হঠাৎ আমরা এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম?—

এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে জনকতক ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ পাছে বন্ধ হয়, এই ভয়ে আমরা বিচলিত হয়ে উঠেছি। সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উচ্চ-শিক্ষা জিনিসটেই হচ্ছে আক্রা। ধরুন যদি বিশ্ববিদ্যালয় একদম অবৈতনিক হয়ে যায়, তাহলেও দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে সেখানে শিক্ষালাভ করা একেবারে আনায়াসসাধ্য হবে না। কেননা প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পরও আরও অন্তত চার-বৎসরের জন্য তার ভরণ-পোষণের ভার তার পরিবারকেই নিতে হবে। ষোল বৎসর বয়সে পৃথিবীর সকল দেশের ছেলেই উপার্জ্জনক্ষম হয়,—সে বয়সে তাকে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেই যদি নিজ নিজ ছেলেদের কর্ম্ম হতে লম্বা অবসর দেন, তাহলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা বাড়বে বই কমবে না। এ সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই উঠেছে, এবং সকল শিক্ষাচার্য্যের মতে প্রতি জাতিকেই এ বিষয়ে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ সমস্যা পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার

সমস্যা নয়। এ হচ্ছে Secondary education-এর সমস্যা। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং এই বয়সে তাদের কতদূর সুশিক্ষিত করা যায়, এই হচ্ছে সে দেশের শিক্ষার প্রধান সমস্যা। Secondary education-এর সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, সুতরাং এ শিক্ষার ব্যবস্থা অবস্থা বুঝেই করতে হয়। উচ্চশিক্ষার কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশ্য যোগ আছে, কেননা স্কুলের চৌকাট ডিঙ্গিয়েই কলেজে ঢুকতে হয়। কিন্তু তাহলেও এ দুই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, উপায়ও স্বতন্ত্র। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, উত্তেজনার মুখে বাণ নিক্ষেপ করলে সে বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে যা দাবী করছি, আসলে তা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নিকট প্রাপ্য। আমার এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আমরা post-graduate শিক্ষা বন্ধ করতে চাচ্ছি। ধরুন তা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে যাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলি, তা একটি দু-ভাগে বিভক্ত Secondary School-য়ে পরিণত হবে। আমাদের দেশের B. A. এবং B. Sc. দু'জনে পৃথকভাবে যে শিক্ষা অর্জ্জন করেন, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে যারা School-leaving certificate নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তারা প্রতিজনে ঐ উপরোক্ত দু'জনের শিক্ষার সম্বল নিয়ে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত, উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট করবার জন্য নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে খাড়া করে তোলবার জন্য। আমাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অনেকপরিমাণে নিষ্ফল হয়, তার মূল কারণ এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কাঁচা ভিতের উপর উচ্চ শিক্ষার পাকা এমারত গড়া যায় না।

(৫)

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এ প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন এবং সেইসঙ্গে নামকরণও করে দিয়েছেন। সে বিষয়ের নাম হচ্ছে আমাদের "শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা"। আমার মতে নামটা উল্টে দেওয়াই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টি যদি "জীবন ও বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা" হত, তাহলে তার আলোচনা কতকটা আমার আয়ত্তের মধ্যে আসত। জীবন জিনিষটি চিরকালই একটা সমস্যা; আর একমাত্র বিদ্যালয় কোন দেশে কস্মিনকালে সে সমস্যার মীমাংসা করতে পারে নি; কেননা শিক্ষা জিনিষটে হচ্ছে জীবনেরই একটা বিশেষ অঙ্গ, এবং শিক্ষা-সমস্যাটা জীবন-সমস্যারই অন্তর্ভূত। শিক্ষার প্রভাব জীবনের উপর অবশ্যই আছে, অন্তত থাকা উচিত,—কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের প্রভাব প্রচ্ছন্ন হলেও প্রচণ্ড। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যালয় জাতীয়-জীবন হতেই তার রস রক্ত সংগ্রহ করে, সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শিক্ষার সার্থকতা কিম্বা ব্যর্থতা অনেকপরিমাণে জাতীয় জীবন ও জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্য কিম্বা দৈন্যের উপর নির্ভর করে। স্কুলমাষ্টারের হাতে এমন কোনও পরশপাথর নেই, যার স্পর্শে ছেলেমাত্রেই সোনা হয়ে ওঠে। কি ভৌতিক জগৎ কি মানসিক জগৎ, উভয় ক্ষেত্রেই

আলকেমিতে বিশ্বাস আমরা হারিয়ে বসে আছি। এ বিষয়ে মনে দুরাশা পোষণ করলে, অবশেষে আমাদের হতাশ হতেই হবে। প্রচলিত শিক্ষার দৌড় কতটা, সে বিচার না করেই দেশসুদ্ধ লোক তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার সেই চল্‌তি পথটা ধরিয়ে দেন, তারপর যখন দেখেন যে সে পথ ধরে তারা কোন একটা সিদ্ধি কিম্বা ঋদ্ধির রাজ্যে পৌঁছতে পারলে না, তখন তাঁরা স্কুল কলেজের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। এক কথায় ,তাঁদের মনে স্কুলকলেজের উপর এক সময়ের অগাধ এবং অযথা ভক্তি আর এক কালে সমান অগাধ ও অযথা রোষে পরিণত হয়। ছেলে পাস না করতে পারলে স্কুলকলেজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এমন বাপ-মা এদেশে দুর্লভ নয়। বলা বাহুল্য এরূপ মনোভাবের মূলে যতটা পুত্রবাৎসল্য আছে, ততটা বিচারবুদ্ধি নেই। আর এ কথাও নিশ্চিত যে, একমাত্র হৃদয়াবেগের বলে পৃথিবীটিকে জয় করা যায় না। কামনা স্থধু আমাদের সাধনার পথ নির্দ্দেশ করে দিতে পারে, তার বেশি কিছু পারে না। সুতরাং শিক্ষার কাছ থেকে কি ফল আমরা কামনা করি, প্রথমেই সেটি জানা দরকার।

(৬)

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রশ্ন সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সাদা বাঙলা হচ্ছে—"আমাদের লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের পেটের সম্বন্ধ কি"? এ প্রশ্নটা অবশ্য মানুষে না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না, কেন না পেটের ভাবনা আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আছে, তারপর আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত

ভদ্রলোকের পক্ষে এ ভাবনা সব চাইতে বড় ভাবনা এবং তাঁদের আশা যে স্কুল কলেজের শিক্ষার কৃপায় তাঁদের ছেলেরা হয় রসনা, নয় লেখনীর সাহায্যে, স্থধু যে দুধেভাতে থাকবে তাই নয়, গাড়ি-ঘোড়াও চড়বে। আর যদি তা না হয় ত সে স্কুল কলেজের দোষ। বলা বাহুল্য যে, এ ইকনমিক-সমস্যার পূরণ, বিদ্যালয় একাহাতে করতে একেবারে অসমর্থ।

আমাদের জাতীয় দৈন্যের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে স্কুল কলেজের বাইরে বহুদূরে যেতে হবে, এবং জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে হবে। যুবকদের জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়া অবশ্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র অর্থের দিকে নজর রাখলে আমরা শিক্ষার সকল অঙ্গ এবং সম্ভবত উত্তমাঙ্গই দেখতে পাব না। দেশশুদ্ধ স্কুল কলেজকে রাতারাতি Technical School-য়ে পরিণত করলে আমরা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে এক লম্ফে যে আরোহণ করব না সে কথা বলাই বৃথা, যে কথা বলা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, উক্ত উপায়ে আমরা যে শিল্প-বাণিজ্যে চোখের পলক না ফেলতেই ইউরোপের উপর টেক্কা দেব তার কোনই সম্ভাবনা নেই। একমাত্র Technical School-এর শিক্ষাও যে বিশেষ কোনও কাজের হয় না, এ হচ্ছে ইউরোপের পরীক্ষিত সত্য। টেকনিকাল স্কুলে শিখে নাকি লোকে স্থধু টেকনিকাল স্কুলের মাষ্টারি করতেই শেখে! হাতে কলমে শিল্প শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারখানা আর তার বৈজ্ঞানিক অংশ শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণে যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সেই কাজের Science শেখবার জন্য কোন কোনও ইউনিভারসিটিতে এক একটি বিশেষ বিভাগ খোলা

হয়েছে। কেননা একদিকে যেমন হাতে ধরে না শিখলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না, অন্য দিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এই সব কারণে আমার মতে শিক্ষা সম্বন্ধে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সম্বন্ধটা কি?—ইহলোকে মস্তিষ্কই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, হস্তপদাদি সব তার আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র।

(৭)

শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে মানব-জীবনের কোনও একটি সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা হয় নিষ্ফল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। আমাদের মনোমত কোনও একটি বিশেষ ছাঁচে সকলকে ঢালাই করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সে উদ্দেশ্য সাধন করবার এ যুগে কোনও উপায় নেই। ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে, ও-হেন চেষ্টার ফলে শিক্ষকদের সেই মনগড়া ছাঁচ অধিকাংশ স্থলে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যেখানে ভাঙ্গে নি, সেখানে যারা তাতে ঢালাই হয়ে এসেছে তারা মানুষ না হয়ে জড়পদার্থ হয়েছে, এবং তাদের নিয়ে সমাজকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। মানুষ ধাতু নয়, কিন্তু দেহমনে একটি organism, এবং এই organism-এর স্ফূর্ত্তির সহায়তা করাই শিক্ষার একমাত্র কাজ; এক কথায় শিক্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। মনে রাখবেন যে, আমরা যাকে জাতি বলি সে হচ্ছে আসলে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি এবং তাছাড়া আর কিছুই নয়। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে

যখন মনের ও শক্তির পার্থক্য এবং তারতম্য আছে তখন শিক্ষারও এক উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাতে বহু লোকের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সকলের মাথাই যে ইউনিভারসিটির ক্ষুরে মোড়াতে হবে এমন কোনও কথা নেই। দেশসুদ্ধ লোকের মানুষ হওয়া চাই, কিন্তু সকলেরই পণ্ডিত হবার দরকার নেই। শিক্ষার এ উদ্দেশ্য যে সকলে সহজে মানতে চান না, তার কারণ, এদেশে আজও সকলে মানুষকে জীব হিসেবে দেখেন না, অনেকেই যন্ত্র হিসেবেই দেখেন।

তারপর অপরাপর জীবের সঙ্গে মানুষের একটি প্রকাণ্ড তফাৎ আছে। মানুষের অন্তরে মন বলে একটি পদার্থ আছে, জীবজগতের অপর কোনও প্রাণীর ভিতর যা নেই। পশু পক্ষীরা আজ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে যেখানে ছিল, সে আজও ঠিক সেইখানেই রয়েছে। কিন্তু মানব-সমাজ এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় অন্নে বস্ত্রে ধনে রত্নে যে এতটা ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠেছে, মানুষ যে আজ এ পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রভু, সে পরিণতির মূলে আছে তার মানস-বল। মানুষের উন্নতির কারণ এই যে তার মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়, অর্থাৎ তার আত্মশক্তিকে ফোটানোও যায় বাড়ানোও যায়। আমরাই হচ্ছি একমাত্র সেই শ্রেণীর প্রাণী যারা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করতে পারে, এবং তা পরস্পরকে আদান প্রদান করতে পারে। আমরাই শুধু মনের কারবার করতে পারি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের মূলধনও বাড়াতে পারি। শিক্ষার একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজ যারা ছেলে আর কাল যারা মানুষ হবে, পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাদের উত্তরাধিকারী করা, এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্তরে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা ও নূতন কর্ম্ম-কৌশল লাভ করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির উদ্বোধন করা। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করতে পরে, এবং যতটা কর্ম্ম-শক্তি লাভ করতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু দুই-ই হচ্ছে আসলে মনের জিনিষ এবং এ-দু'য়ের ভিতর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করাই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। একটা ইংরাজি বচন আমাদের মনের উপর এ যুগে অযথা রকম অধিপত্য লাভ করেছে, সে হচ্ছে struggle for existence. এ কথা নিত্য শুনতে পাওয়া যায় যে, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা আমাদের struggle for existence-এর সহায়। ঐ মস্ত কথাটার সাদা অর্থ হচ্ছে "আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা"। এ প্রচেষ্টা জীব-মাত্রেরই অস্থি মজ্জাগত, এবং যেহেতু আমরাও জীব সে কারণ ও-প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষেও নৈসর্গিক। কিন্তু পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে আমাদের ভিতর উপরন্তু আর একটি প্রবৃত্তি আছে, যার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমার সুধু আত্মরক্ষা করেই সন্তুষ্ট থাকিনে, মনে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে ওঠবার প্রচেষ্টাও আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। এবং শিক্ষা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। যদি কেউ বলেন যে তা বটে, তবে আগে আত্মরক্ষা পরে আত্মোন্নতি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য ও দুয়ের ভিতর ওরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নেই। আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাই যে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, এর প্রমাণ মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেয়।

(৮)

মানবজাতির যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানে মানুষ মাত্রেরই যে অধিকার আছে এবং সে অধিকারে অধিকারী হলে, মনুষ্যত্ব যে স্ফূর্ত্তি লাভ করে এই বিশ্বাসের বলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ষ্টেটের খরচায় প্রতি বালককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুধু তাই নয়, প্রতি বালক শিক্ষিত হতে বাধ্য। এরই নাম Compulsory primary education.

তারপর বার চৌদ্দবৎসরে এদের মধ্যে অধিকাংশকে জ্ঞানার্জ্জনের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ economic,—দরিদ্রের সন্তানের এই বয়সেই জীবিকা অর্জ্জনের প্রয়োজন হয়, কেননা তাদের বেশি দিন নিষ্কর্ম্মা রাখায় তাদের এবং সমাজের সমান ক্ষতি হয়। আরও একটি কারণ আছে। যাঁরা ছেলের মনের খোঁজ রাখেন তাঁদের মতে কৈশোরে পদার্পণ করবামাত্র অনেক ছেলের মনে কাজ করবার প্রবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান-চর্চ্চার অপ্রবৃত্তি জন্মায়,—অর্থাৎ তারা বাঁধা না খেয়ে সংসারে চরে খেতে চায়। সুতরাং ও বয়সে তাদের জোর করে কর্ম্মক্ষেত্র হতে দূরে রাখার কোনই সার্থকতা নেই। নিষ্ক্রিয় হলে যে জ্ঞানী হতেই হবে এমন কোনও নৈসর্গিক নিয়ম নেই। আমাদের যত ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তার ভিতর অনেকে যে যুগপৎ অশিক্ষিত ও অকর্ম্মণ্য হয়ে বেরোয় তার অন্যতম কারণ এই যে চৌদ্দ পোনেরো বৎসর বয়সে তাদের মনোমত কাজে তাদের লাগতে দেওয়া হয় নি।

তারপর চৌদ্দ থেকে আঠারো বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত

অল্পসংখ্যক ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তার নাম secondary education. ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্র তারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে এই Secondary education-ই সব চাইতে মূল্যবান, কারণ এই শিক্ষাই আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। আঠার বৎসর বয়সে বিদ্যালয় থেকে নানা বিষয়ে সেই শিক্ষালাভ করে বহির্গত হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয়, যে শিক্ষার ফলে জীবনের যে কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কৃতিত্ব লাভ করতে পারব। আমাদের economic অবস্থার সঙ্গে এই শিক্ষাই যথার্থ খাপ খায়। সুতরাং এ শিক্ষার যাতে সুব্যবস্থা হয় সেই বিষয়েই আমাদের একান্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর এই বয়েসের মধ্যেই যে যথেষ্ট সুশিক্ষিত হওয়া যায় তার প্রমাণ ইউরোপের সকল দেশেই পাওয়া যাবে।

তারপর যে ক'টি বাকী থাকে তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে চেষ্টা করে। এও কতকটা অবস্থার গুণে। উচ্চ-শিক্ষা ইউরোপের অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়ের এক রকম একচেটে বললেও হয়। বাইশ তেইশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত এক পয়সা রোজগার না করে পরিবারের অন্নে প্রতিপালিত এবং পরিবারের অর্থে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারে এমন যুবকের দল সকল দেশেই দুর্লভ। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি দরিদ্রসন্তান উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুফলে বঞ্চিত থাকবে? তার উত্তর—অবশ্য হবে যদি না তাদের নিজগুণে Scholarship নেবার ক্ষমতা থাকে। দরিদ্র সমাজও যদি পৃথিবীর সকল ভাল জিনিষে ধনীর সঙ্গে সমান অধিকারী হত তাহলে দারিদ্র্য ত আর

কষ্টের কারণ হত না। এরূপ হওয়া উচিত কি না, সে হচ্ছে শিক্ষার নয় সমাজের সমস্যা। ইউরোপের বহুলোকের মতে কোনও সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের এতটা অর্থগত পার্থক্য থাকাটা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এঁদের চেষ্টায় যদি Socialistic State গড়ে ওঠে তাহলে হয়ত mass education এবং high education একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন সমাজে বড় ছোটর প্রভেদ থাকবে ততদিন শিক্ষারও উচ্চ নীচ প্রভেদ থাকবে। তবে এ সব প্রশ্ন আমাদের মুখে শোভা পায় না। এই জাতিভেদের দেশে আমরা সমাজে ছোট বড়র প্রভেদ মোটেই দূর করতে চাই নে, তার উপর এদেশে ধনীর অপেক্ষা দরিদ্রেরাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বেশি লালায়িত, তার কারণ অধিকাংশ ছেলের বাপ ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষিত করতে চান না, সুধু ধনী করতে চান। এবং সেই কারণ উচ্চ-শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সস্তা করবার জন্য সকলে ব্যগ্র। এ মনোভাব স্বাভাবিক হলেও প্রশ্রয় পাবার উপযুক্ত নয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ পারিবারিক মনোভাব দিয়ে জাতীয় শিক্ষার-সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঘরের প্রদীপ ঘরই আলো করতে পারে কিন্তু বাইরের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না; তার জন্য চাই বাইরের আলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা যে কতটা অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞান তবে আমার দুঃখের কারণ এই যে, আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটেই সুশিক্ষিত সম্প্রদায় নয়। যদি তাঁরা সত্যই সুশিক্ষিত হতেন তাহলে কোন আপশোষের কারণ থাকত না, কেননা আমার দৃঢ় ধারণা যে যে-জাতির অনেকে সুশিক্ষিত সে জাতির কি আর্থিক কি আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি অনিবার্য্য।

(৯)

এ সত্য নিঃসন্দেহ সর্ব্ববাদী সম্মত যে, যে-শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্তি দেয় না শক্তি দেয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আর যে মনের জীবনের উপর কোন সু-প্রভাব নেই সে মন মুক্তও নয়, শক্তিশালীও নয়, এক কথায় শিক্ষিতই নয়।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে জীবনকে চেপে ধরতে পারেন নি, এবং নিজ শক্তিতে তা যে মনোমত করে গড়ে তুলতে পারছেন না,—তার প্রমাণ আজকের দিনের এই অন্ন-সমস্যা। এই ব্যর্থতার পরিচয় একমাত্র economic ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমান পাওয়া যাবে। এই নব-শিক্ষার প্রভাব যে আমাদের সামাজিক জীবনের উপর এক রকম নগণ্য—তা কে অস্বীকার করবে? আর এ কথাও নিঃসংশয় যে আমরা যাকে ইকনমিক-সমস্যা বলি সেটি আমাদের সামাজিক মনোভাব, সামাজিক চরিত্র ও সামাজিক বিধি নিষেধের, এক কথায় সামাজিক জীবনের বিশেষরূপে অধীন। যদি কোন সমাজের প্রিয় প্রথা ও চিরাগত সংস্কার সকল বর্ত্তমান যুগে Struggle for existence-এর অনুকূল হওয়া দূরে থাক প্রতিকূল হয় তাহলে সে প্রথা ও সে সংস্কার বজায় রেখে জীবন-সংগ্রামে কি করে জয়ী হওয়া যেতে পারে? একমাত্র রসনা ও লেখনীর বলে? লেখনি ও রসনার শক্তিতে আমি অবিশ্বাসী নয়—কিন্তু সে শক্তি সত্যের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ এ উভয় রাজ্যের যথার্থ জ্ঞানের উপরই মানুষের আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত। রসনা ও লেখনি দুইই অবশ্য মিথ্যাকে জন্ম দিতে পারে এবং তাকে প্রশ্রয়ও দিতে পারে,

কিন্তু তার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা জাতি বিশেষকে সুস্থ করতে পারে না, সজ্ঞান করতে পারে না, সক্রিয় করতে পারে না। আর সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সত্যপ্রিয় হওয়া চাই, সত্যসন্ধিৎসু হওয়া চাই, সত্যসন্ধ হওয়া চাই।

বিদ্যালয় ছেলেদের কাছে যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেয়, সে জ্ঞান আত্মসাৎ করা আর না করা সম্পূর্ণ ছেলের এক্তিয়ার। উচ্চ-শিক্ষা যুবকদের সঙ্গে মনুষ্যত্বের উচ্চ মনোভাব উচ্চ আইডিয়ালের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে—কিন্তু সে ভাব সে আইডিয়াল, যুবকদের মনে ঢুকিয়ে দিলেও সম্পূর্ণ বসিয়ে দিতে পারে না; যদি বাপ মা শিক্ষকের এবং সমাজ বিদ্যালয়ের সহায়তা না করে। ভুলে যাবেন না যে বিদ্যালয় একমাত্র শিক্ষালয় নয়—প্রতি পরিবার এক একটি শিক্ষালয় আর সমাজ হচ্ছে একটি মহাবিদ্যালয়। সমাজ যদি বিদ্যালয়ের উল্টো টান টানে তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল কি হবে? স্কুল কলেজে অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের মনের উপর একটা বোঝামাত্র হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে সংগৃহিত আইডিয়াল সুধু বক্তৃগত হয়ে থাকবে।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সমাজ কি সত্যই চায় যে স্কুল কলেজের শিক্ষা সত্য সত্যই দেশের ছেলের মনে বসে যাক এবং তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে শিখুক? অপর পক্ষে এই কথাটাই কি সত্য নয় যে, সমাজ চায় এই নব-শিক্ষা যেন ছেলেদের মন স্পর্শ না করে; এবং যে মন দিয়ে স্কুল কলেজের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আর যে মন দিয়ে জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে—এ দুই মন সমান্তরল রেখায় ইংরাজিতে যাকে বলে

parallel lines-য়ে চলুক। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেরা স্কুলে বলবে পৃথিবী গোল, আর ঘরে এসে মানবে যে পৃথিবী ত্রিকোণ। কেননা একবার যদি তারা তাদের শিক্ষার দ্বারা আমাদের সামাজিক সংস্কার গুলোকে যাচাই করতে সুরু করে তাহলে তারা হয়ত দেখতে পাবে যে অনেক জিনিস যা আমরা চৌকোশ বলে ধরে নিয়েছি তা শুধু গোল নয়, মহাগোল। এরূপ মনোভাবের মূল কি তা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমাদের শিক্ষা একে বিদেশী, তায় আবার নূতন—আর আমাদের সমাজ একে স্বদেশী তায় আবার প্রাচীন, সুতরাং এর একটিকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে অপরটিকে হীনবীর্য্য করে দিতেই হবে। তাই অন্ধ সংস্কারের সাহায্যে আমরা শিক্ষাকে পঙ্গু করে ফেলতে সদাই যত্নবান!

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, যে শিক্ষায় মানুষের মনকে যুগপৎ মুক্তি ও শক্তি না দেয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, কেননা তাতে মানুষকে person করে তোলে না। বহুকাল পূর্ব্বে জগৎ-পূজ্য জর্ম্মান দার্শনিক এই মহা-সত্যের আবিষ্কার করেন যে, person শব্দের অর্থ হচ্ছে Self conscious self-determining individual. মানুষে পশুতে এই খানে তফাৎ যে, পশু মাত্রেই কতকগুলি নৈসর্গিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত, তাদের ভিতর personality বলে কোনও জিনিস নেই। এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মনে এবং চরিত্রে Self consciousness and self-determination-এর শক্তি উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাকে চিন্তা করবার ও কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত দরকার। তারপর আর একটি কথা;—আমরা যাকে শক্তি বলি তার অর্থ হচ্ছে reality-র উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা—বলা বাহুল্য

reality-র জ্ঞান না জন্মালে কেউ আর তার উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। আমাদের নব-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের reality-র জ্ঞান বাড়া দূরে থাক ক্রমে কমে যে আসছে তার কারণ আমাদের নব-শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা জিনিসটি সব দেশেই একটি সমস্যা কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটি যে এত ভীষণ সমস্যা হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ সে শিক্ষা আমাদের জীবনের পক্ষে অস্পৃশ্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, ইকনমিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা সবই এমন, যে আমাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই খাটাবার আমরা সুযোগ পাই নে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা খাটাবার আমাদের অধিকার পর্য্যন্ত নেই।—

এ অবস্থায় মনের সুখে থাকতে পারেন শুধু তাঁরা যাঁরা নিজের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে গেলেই পরের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, এবং পরের দুরবস্থা যদি কালেভদ্রে চোখে পড়ে ত এই বলে মনকে আশ্বস্ত করেন যে, সে দুরবস্থা তাদের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু এদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা এই অতিনিন্দিত নব-শিক্ষার প্রসাদে স্বজাতির এই বর্ত্তমান দুর্গতি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারেন না, কিম্বা মোটার গাড়ীতে চড়ে কলেজষ্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় ইউনিভারসিটি Buildings নামক বুরোক্রাট এবং পেট্রিয়টের সমান চক্ষুঃশূল সরস্বতীর মন্দিরটিকে অম্লান বদনে ভূমিসাৎ করে দেবারও প্রস্তাব করতে পারেন না। দেশ উদ্ধারের অত সহজ মীমাংসা করবার পক্ষে তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়েই প্রতিবাদী হয়। ভবিষ্যতে বাঙালী জাতি, আমাদেরই অনুরূপ হবে, আমাদেরই মত তারাও নির্জ্জীব, নিরানন্দ এবং

পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকবে, আমাদেরই মত তারা শুধু ধনে নয় মন ও চরিত্রেও মধ্যবিত্ত হবে, আমাদেরই মত তারা জীবনের উৎসবের দর্শক মাত্র থাকবে, কিন্তু তাতে যোগদান করবার অধিকার লাভ করবে না; এ কথা মনে হলে এ শ্রেণীর লোকদের মন নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তখন জীবনের সাধ তাদের মুখে তিতো লাগে। কিন্তু এ নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দিতে আমরা মোটেই চাই নে। একটি ইংরেজ লেখকের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, খানায় পড়ে থাকলেও আকাশের তারা দেখবার অধিকারে মানুষ বঞ্চিত হয় না। আমাদের ভবিষ্যতের গগনে সেই তারা দেখতে পাই বলে আমরা শিক্ষার উন্নতির জন্য এত লালায়িত। যদি কেউ বলেন যে আমরা যা দেখছি সে তারা নয়—আকাশকুসুম, তার উত্তর তথাস্তু—কিন্তু তাই বলে খানায় পড়ে থাকাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। ওঠবার চেষ্টা আমাদেরই করতেই হবে, ফলাফল অদৃষ্টের হাতে।

(১০)

আমি বরাবর শিক্ষার উন্নতি, সমাজের উন্নতি, জাতির উন্নতি প্রভৃতি নানারূপ উন্নতির কথা বলে আসছি কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নতি সাধন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ কোনও কথা বলি নি। বর্ত্তমান শিক্ষার সর্ব্বাগ্রে কোন্ সংস্কার করা প্রয়োজন, সংক্ষেপে সেই কথাটা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। কারণ আমার ধারণা যে, সে সংস্কার না করে অপর সংস্কার করতে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষার গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।

উন্নতি অবশ্য পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। জড়পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তার নিজের ভিতর থেকে কোনও পরিবর্ত্তনের তাগিদ আসে না। লোষ্ট্রকাঠ অনন্তকাল পর্য্যন্ত এক অবস্থাতেই থাকতে পারে, যদি বাহ্যশক্তি তার পরিবর্ত্তন না ঘটায়।

জীবের ইতিহাস হচ্ছে নিত্য তার অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী। প্রথমত বৃদ্ধির তারপর হ্রাসের। বীজ হতে বৃক্ষ জন্মায়, বড় হয়, একটা সীমা পর্য্যন্ত বাড়ে তারপর উত্তরোত্তর তার জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়ে এসে শেষে তার মরণ দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই হ্রাসবৃদ্ধি হয় নৈসর্গিক কারণে, এ অবস্থান্তর ঘটার ভিতর তার মনের কিম্বা ইচ্ছার কোন কার্য্য নেই। তার জীবন-মরণ দুই-ই দৈবাধীন, সে বেচারা অপমৃত্যুকেও এড়াতে পারে না, আত্মহত্যাও করতে পারে না।

মানুষের ধর্ম্ম কিন্তু স্বতন্ত্র। আমাদের দেহের হ্রাসবৃদ্ধির উপর আমাদের বিশেষ কোনও হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলে পর্ব্বত প্রমাণ উঁচুও হতে পারি নে, চিরদিন দেহে ছোট-ছেলেও থেকে যেতে পারি নে। কিন্তু মনের হ্রাসবৃদ্ধি অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন। আমরা ইচ্ছা করলে মনে ছোট ছেলেও থেকে যেতে পারি, জ্ঞানী গুণীও হয়ে উঠতে পারি। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি জিনিস মানুষ তার মনোমত করে গড়তে পারে এবং সে গড়ার ভিতর মানুষের ইচ্ছা-শক্তিই আসল শক্তি। সংক্ষেপে মানুষে আত্ম-চেষ্টায়—তার অবস্থার অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, এবং মানব-সমাজের উন্নতি তার অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে—সে উন্নতি অদৃষ্ট নয়, পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে বদলাতে পারে বলে সে বদল উন্নতির সহায়ও হতে পারে অবনতির সহায়ও হতে পারে। প্রতি বদলের মুখে এ উভয় সঙ্কটে মানুষকে যে পড়তে হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে অবনতির ভয়ে যদি মানুষের আত্ম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বন্ধ করো তাহলে সেই সঙ্গে তার উন্নতির পথও রোধ করা হবে। সুতরাং এ বিষয়ে মানব-সমাজকে experiment করতে দিতেই হবে, ফলে উন্নতি কি অবনতি হবে তার প্রমাণ ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

মন ও জীবনের এই লড়ালড়ি পৃথিবীর সকল দেশে চিরদিনই চলে আসছে, কারণ মন চিরকালই জীবনকে নূতন পথ দেখাতে চায়, আর জীবন চিরকালেই তার অভ্যস্ত পথ ত্যাগ কয়তে আপত্তি করে। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে, জীবনের পক্ষে এক জায়গায় জমে গিয়ে জড়-পদার্থে পরিণত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে সেই জন্য মনের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে ক্রমান্বয়ে টেনে তোলা, নূতন নূতন পথে তাকে চালিত করা।

নব শিক্ষার সহিত প্রাচীন সমাজের এই লড়াই সব দেশে সব যুগেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে যে হচ্ছে তার তিতর কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই। এমন কি দু-পক্ষ সকল দেশে একই বুলি আওড়ান। নূতন জ্ঞান এবং, তৎপ্রসূত নূতন আইডিয়াল জীবনকে ডেকে বলে আমাকে অনুসরণ কর, তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাব, আর প্রথা-গ্রস্ত জীবন বলে যে-পথে বহুদিন চলে আসছি সে পথ ত্যাগ করলে সর্ব্বনাশ হবে, কেননা তোমার ঐ নূতন পথ ত্রিদিবের নয়, রসাতলের পথ।

তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে অপর দেশে নবশিক্ষা সামাজিক জীবনকে খাড়া করে তোলে আর আমাদের দেশে সামাজিক জীবন নবশিক্ষার কোমর ভেঙ্গে দেয়। এর কারণ কি? সহজ উত্তর আমাদের নবশিক্ষা বিদেশী শিক্ষা বলেই, জীবনের উপর তার প্রভাব কম। কিন্তু এ উত্তর, সহজ হলেও সত্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাস যুগ যুগ ধরে, এই সত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে যে, এক জাতির মন অপর আর এক জাতির মনের স্পর্শে জেগে ওঠে, সংঘর্ষে সজ্ঞান হয়। কালক্রমে জাতীয় মন যখন নিবে আসবার উপক্রম হয়, তখন বাইরে থেকে তাকে উস্‌কে দেওয়া দরকার। সত্য তা সে দেশীই হোক বিদেশীই হোক সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশে শিক্ষার এ-দুর্গতির কারণ যে সে শিক্ষা বিদেশী ভাষাতে দেওয়া হয়।

আমরা এই বলে জাঁক করি যে ইংরাজি আমরা যেমন শিখি পৃথিবীর অপর কোনও জাত তেমন শিখতে পারে না। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। অপর জাতের সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে, যদি নিজেদের বিদ্যের বহরটা মেপে দেখি ত, দেখতে পাই যে আমাদের অধিকাংশ লোকের ইংরাজি জ্ঞান যেমন মুষ্টিমেয় তেমনি খেলো। অধ্যাপকেরা বই না পড়িয়ে নোট দেন বলে তাঁদের উপর চারধার থেকে আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু এ নোট-দানের কারণ কি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যার্থীদের অধিকাংশের ইংরাজিভাষার দখল এত কম যে তাঁরা Text-book পড়ে তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারেন না,—নিজের ইংরাজিতে সে মর্ম্ম প্রকাশ করা ত তাঁদের একেবারে সাধ্যের অতীত। এ অবস্থায় অধ্যাপকদের দায়ে পড়ে, বিশ্ববিদ্যার সার সংগ্রহ করে তার এমন সব নিরেট বড়ি পাকিয়ে দিতে হয়, ছেলেরা

যা কলেজে গিলে সেনেট হলে উগলে দিতে পারে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, যে যত বেশি বড়ি গিলিয়ে দিতে পারে সে—তত ভাল অধ্যাপক, আর যে যত বেশি বড়ি ওগলাতে পারে সে তত ভাল ছেলে। তারপর আর একটি কথা, হাজার অপ্রিয় হলেও সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য। অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে অনেকের ইংরাজি-জ্ঞান ছাত্র-বাবুদের জ্ঞানের চাইতে বড় বেশি প্রবুদ্ধ নয়। এর কারণও স্পষ্ট। কাল যাঁরা শিষ্য ছিলেন আজ তাঁরা গুরু। হতে পারে যে জর্ম্মান ফরাসী ইতালীয়দের চাইতে আমাদের ইংরাজি জ্ঞান বেশি। তার কারণ এ শিক্ষার আমরা যে দাম দিই সে দাম তারা দেয় না। সে দাম হচ্ছে স্বভাষাকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারানো। বিদেশী ভাষার মারফৎ পাওয়া শিক্ষা আমাদের মনে বসে না, কথার কথা থেকে যায়। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে এত বক্তৃতা করেছি যে এস্থলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের স্কুলে ছেলের মন এবং বস্তুজগতের মধ্যে, ইংরাজি ভাষা একটি পুরু পর্দ্দার মত ঝুলে থাকে, ফলে তাদের মনে reality-র জ্ঞান এক প্রকার নষ্ট হয়েই যায়। বস্তুর সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ যে বাচ্য বাচকের সম্বন্ধ, বালককালে বিদেশী ভাষা শিখতে গেলে সে জ্ঞান হারানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ, বিদেশী ভাষার শব্দের সঙ্গে বস্তুর কোনও সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, আছে সুধু স্বদেশী শব্দের সঙ্গে। Translation এবং re-translation-এর প্রসাদে সুধু এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। ভাষার সঙ্গে reality-র যোগাযোগের জ্ঞান জন্মে না।

স্কুলে এ জ্ঞান একবার হারালে কলেজে এসে আর তার পুনরুদ্ধার করা যায় না। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি এ বৎসরের প্রাথমিক B L-এর কাগজ পরীক্ষা করছি, শ'খানেক কাগজ দেখা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচখানিতে moveable এবং immoveable property-র কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জানেন?—দু'দিন পরে যাঁরা উকিল হবেন তাঁদের ধারণা যে-সম্পত্তি অচল, তাই immoveable property, যথা—পর্ব্বত এবং যে-সম্পত্তি সচল তাই হচ্ছে moveable property, যথা—নদী। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা যে কি তা বাড়ীর চাকর দাসীরাও জানে, কিন্তু স্কুলের ইংরাজি শিক্ষার কৃপায় B. A. B. Sc-রাও জানেন না। একজন লিখেছেন যে, incorporeal property হচ্ছে সেই সম্পত্তি which has no physical existence। জবাব ঠিক হয়েছে, কিন্তু তিনি তার উদাহরণ দিতে গিয়ে, copyright ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে, উল্লেখ করছেন "air." কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্? কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। যিনি লিখেছেন air হচ্ছে সেই বস্তু যার কোনও physical existence নেই শুনতে পাই তিনি হচ্ছেন B. Sc. পাশ! এই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, স্কুলে সকল শিক্ষা ইংরাজি ভাষার মারফৎ হওয়াতেই আমাদের শিক্ষা এতটা নিষ্ফল হচ্ছে? আপনারা যদি Secondary School-য়ে ইংরাজিকে Second language করতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস দশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতির মনের চেহারা ফিরে যাবে, এবং তখন দেখা যাবে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে আর আকাশ পাতাল প্রভেদ নেই।

আমি এই বলে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি যে, আমি একজন স্টুডেন্ট এবং সেই স্টুডেন্ট হিসেবেই আমি বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যার আলোচনা করেছি, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি তাই বুঝতে চেষ্টা করেছি, তার কোনও কাটা-ছাঁটা মীমাংসা করে দিতে সাহসী হই নি। আমি মানি যে পেটের ভাবনা অবশ্য আমাদের সর্ব্ব-প্রধান না হলেও সর্ব্বপ্রথম ভাবনা কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে পেট যদি মস্তিষ্কের চালক হয়, তাতে পেটের কিছু লাভ হয় না, কিন্তু মস্তিষ্কের অশেষ ক্ষতি হয়। বাঙালী যে মারোয়াড়ি নয় এ দুঃখ আমরা আগেও করেছি। রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির সর্ব্বনাশ যে literary education-এর ফলে হয়েছে, এই বিশ্বাসের বলে আমরা তথাকথিত Scientific education-এর জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিলুম। ফলে কলেজে একদল ছেলেদের গোড়াথেকেই একমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হল। সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা কি লাভ করেছি? আমাদের আশা ছিল, যে ছেলেরা কাব্য দর্শন ইতিহাস ব্যাকরণ ত্যাগ করে বিজ্ঞান ধরলেই, এক কথায় লাইব্রেরী ছেড়ে লাবরেটরিতে ঢুকলেই বঙ্গমাতা অন্নপূর্ণা হয়ে উঠবেন, অন্তত B. Sc.-দের ঘরে টাকা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি? দেশ 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' হয়ে ওঠা দূরে থাক, B. Sc.-র অন্নচিন্তা B. A-র চাইতে একচুলও কম নয়, এবং উভয়ের বাজার-দর এক, বড় বাজারেও, বৌ-বাজারেও।

আপনারা এই কথাটা স্মরণ রেখে শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা করবেন যে বাঙালী আসলে সরস্বতীভক্ত জাত এবং তারা যেদিন ভাবের চর্চ্চা

থেকে বিরত হবে, সেদিন তারা তাদের স্বধর্ম্ম হারাবে। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি কলকারখানা গড়তে না পারুক, তার চাইতে একটা ঢের বড় জিনিস গড়েছে এবং তার নাম হচ্ছে নব-ভারত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কথিকা।

—*—

বনের ছায়াতে যে, পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জ্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠ্‌ল, "আমাকে চিন্‌তে পার না" ?

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম, বল্‌লেম, "মনে পড়চে বটে কিন্তু ঠিক নাম করতে পারচিনে"।

সে বল্‌লে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক"।

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা, দিলে যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বল্‌লেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মত কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেচ" ?

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাস্‌লে। আমি বুঝলেম সবটুকু রয়ে গেচে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েচে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজো তোমার কাছে রেখে দিয়েচ" ?

সে বল্‌লে, "এই দেখনা আমার গলার হার"।

দেখ্‌লেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপ্‌ড়িও খসে নি।

আমি বল্‌লেম, "আমার আর ত সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও ত ম্লান হয়নি"।

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বল্‌লে, "মনে আছে, সেদিন বলেছিলে তুমি সান্ত্বনা চাওনা, তুমি শোককেই চাও" !

লজ্জিত হয়ে বল্‌লেম, "বলেছিলেম বটে, কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন্ ভুলে গেলেম"।

সে বল্‌লে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি ত ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও"।

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লেম, "একি তোমার অপরূপ মূর্ত্তি" !

সে বল্‌লে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েচে শান্তি"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একখানি পত্র।*

—:*:—

জেমো, কান্দি।
১লা জুলাই, ১৯১৬।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ পাইলাম। আনন্দ এই যে ঐ সকল দুরূহ প্রশ্ন আপনার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে—বিষাদ এই যে আপনার পত্রে একটা যেন অবসাদের ভাবের ছায়া আছে।

যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্য ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেষ্টা। যে চেষ্টায় মানব-জাতির অগ্রনীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্ব্বদেশের সুধীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন, আমার মত ক্ষুদ্র-ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাইবেন কিরূপে? আমার নিকট যে উত্তর চাহিয়াছেন সে আমার প্রতি আপনার নিরতিশয় শ্রদ্ধার ফল।

* আজ ক'দিন হল—৺ত্রিবেদী মহাশয়ের একখানি পত্র আমার হস্তগত হয়েছে—যেখানি প্রকাশ করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। কেননা এই চিঠিখানিতে লেখক তার মনের কথা আশ্চর্য্যরকম সরল ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ চিঠি প্রকাশ করবার কোন বাধাও নেই, ব্যক্তি বিশেষকে লেখা হলেও এ পত্র প্রাইভেট নয়, কেননা যাঁকে এ পত্র লেখা হয়েছিল সে ব্যক্তি ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ, তিনি একটি ষোলো বৎসরের যুবককে পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু বলে সম্বোধন করেছেন। সম্পাদক,

খুব সম্ভব আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই। দূর হইতে কাগজ পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইতেন আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র-মানবের ন্যায় অতি দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ জীব—আমাতেও কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। আপনিও যেরূপ জীবন সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয় সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আমার দশাও ঐরূপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মীমাংসা পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি তাহা নহে। মনুষ্যমাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয়ত অনেকের চেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উত্তরে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব?

আমি যতদূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, ততদিন মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই—ততদিন religiousness-ই একমাত্র উপায়;—এই religiousness-এর মোটামোটি দুইটা লক্ষণ, একটা optimistic.

—তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের ভাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে? এইরূপ attitude কোনরূপ যুক্তিতর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর করিয়া যুক্তিতর্ক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যক। যে পারে সেই সফল হয়।

আর একটা দিক্ দৈন্যের দিক্—আমি পাপী তাপী দীন, আমার

কি হইবে—হয়ত তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Despondency আনে যে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণব ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slough of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ সম্পূর্ণ acquiescence দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত খৃষ্টানদের মধ্যে John Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত স্বয়ং চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের পক্ষে মরণের বিভীষিকা ছিল বলিলে অনুচিত হইবে—এখানে বিরহের যাতনা—প্রাণ স্বরূপের সহিত বিরহ সম্ভাবনায় তিনি কেবলই হা হা করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহাকে যদি ভগবান বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মানুষকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে পথিক তাঁহাদিগকে অল্প-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

ইহা সাধনোন্মুখ জীবের অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন না, বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের ইচ্ছায় ব্যাকুল।

মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা যাহা মরণ ভয় হইতে উৎপন্ন তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্ত্তা ও জগৎ-বিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ সমস্তই আমার লীলা-

ভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া তর্কদ্বারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।

আমার রচনার মধ্যে, "জিজ্ঞাসা"র ও "কর্ম্মকথা"র শেষ দিকে—এই কথাটি বুঝাইবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। যে চেষ্টায় স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমার মত কীট কতদূর করিবে!

যাহাই হোক আপনার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আপনাকে দু'একখানা গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। যদি না পড়িয়া থাকেন, পড়িতে পারেন। বাংলায় ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অভয়ের কথা" গ্রন্থখানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-এর Varieties of religious Experience (Clifford Lectures) খানি পড়িতে পারেন। আমি religiousness-এর যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাই তাহা আপনি ঐ পুস্তকে পাইবেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত নিজের মনে খাড়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি। কিন্তু ক্ষুদ্রপত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব? উহা আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল—এখন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জীবন সমস্যার সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাখিয়াছি—আপনাকে সহসা কিরূপে সেই attitude-এ আনিব?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যে কাতর—সকল সময়ে চিঠি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পত্রদ্বারা এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমার শারীরিক অবস্থা মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের হেতু আমি উহাতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধাবলি গত দুই বৎসর ধরিয়া বাহির হইতেছে, উহার শেষভাগে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আপনি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার নমস্কার লইবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মুক্তি।

—:০:—

যে সময়ের কথা ব'লছি তখন দার্জ্জিলিং-এ মানুষের অভাব না থাকলেও দেবতার প্রভাব একেবারে হ্রাস হয় নি; এবং বার্চ্‌হিলে একালের শিশু-মানবের দোলনার পরিবর্ত্তে সে কালের শিশু-দেবতার পুষ্পধনুটাই ছিল একমাত্র খেল্‌বার জিনিস—যদিও দেখ্‌বার নয়।

এ কহিনীটি আর কিছুই নয়—সেই আদিযুগের বার্চ্‌হিল-ইতিহাসের একটা অধ্যায় মাত্র; এবং এটা রচিত হ'য়েছিল শুদ্ধ তিনটি প্রাণীকে নিয়ে—একটি পুরুষ, একটি নারী এবং একটি গাধা।

পুরুষটি থাকত চৌরাস্তার কাছে একটা হোটেলে—নিতান্ত অনাত্মীয়দের মধ্যে; নারীটি থাকত জলাপাহাড়ের একটা বাড়ীতে—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে; এবং গাধাটি থাকত ভুটিয়া-বস্তির একটা আস্তাবলে—আত্মীয়-অনাত্মীয় উভয়বিধ চতুষ্পদেরই মধ্যে।

নিয়তির বিধানে এই তিনটি প্রাণী একদিন বার্চ্‌হিলে একত্রিত হ'য়েছিল—এবং তারই ফলস্বরূপ এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি।

(২)

সে দিন শরতের অপরাহ্ণ। বার্চ্‌হিলের সর্ব্বোচ্চ চূড়োটার পশ্চিমে খানিকটা নীচের দিকে একখানা নাকবারকরা পাথরের

উপর নারী ব'সেছিল এবং পুরুষ তার পায়ের তলায় আর একখানা পাথরে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নারীর পরিধেয়ের আগুন-রংটা তাকে মানিয়ে ছিল ভাল। এই থেকে তার রূপের এবং বয়সের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পুরুষের রূপের পরিচয় অনাবশ্যক এবং তার গুণের পরিচয় দেবার মতন বয়স তখনও হয় নি।

পুরুষ ব'লছিল—"সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করে ফেলেছি। রাত্তির দেড়টার সময় ডাণ্ডি অপেক্ষা ক'রবে—তোমাদের বাড়ীর সেই উপরকার রাস্তাটায়। রাত্তির থাকতেই ঘুম্ ছাড়িয়ে যাবো এবং কাল এমন সময় আমরা কালিম্পং-এ"।

পুরুষের স্বর স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যঞ্জক। নারী কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ কোমল স্বরেই একটু অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন ক'রলে—"এর মধ্যেই"? তারপর কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে ব'ললে—"কিন্তু তোমার দিক থেকেও তো কথাটা একবার ভেবে দেখতে হয়। সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'রবে একটা চা-বাগানে কাটিয়ে"?

পুরুষ যা' উত্তর ক'রলে তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, সে যদি তার প্রেমের সৌরভে নারীর নষ্ট গৌরবটা ঢেকে দিতে পারে—তাতেই তার জীবনটা সার্থক হ'য়ে উঠবে।

"এর বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই"।

উত্তেজনা সত্ত্বেও পুরুষের স্বরে এমন-কিছু ছিল যা' নারীকে একেবারে স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সেটা পরিপূর্ণ প্রেমের আবেগ, গভীর সমবেদনার প্রকাশ, তীব্র কামনার প্রেরণা—অথবা এই তিনের মিশ্রন-সঞ্জাত একটা কিছুও হ'তে পারে।

নারী কিন্তু ঠিক পুরুষের কথাই ভাবছিল না। তার নিজের ব্যথাটা যে কোথায় সেইটেই বারবার মনে প'ড়ছিল। সংসারের অপমান-অত্যাচার সে বরণ ক'রে নিতে পারত; কিন্তু অভিমানের দাবীটা যেখানে বড্ড বেশি, অবহেলাটা যে সেখানে তেমনিই অসহ্য!..... বর্ত্তমানটা যাই হোক না কেন—ভবিষ্যৎটাই কি খুব আশাপ্রদ? সমাজ-সৌরচক্র থেকে গতিভ্রষ্ট হ'য়ে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে বাকী জীবনটা কাটাবে সে? প্রেম তো একটা নেশা মাত্র। যদি নেশা কেটে যায়, তা'হলে.....?

মুখ ফুটে ব'ললে—"এ-রকম ভাবেই যদি চলে তো চলুক না কেন"?

"না—তা' আর চলতে পারে না"।

কেন চ'লতে পারে না পুরুষ সেটা বুঝিয়ে ব'ললে না। কিন্তু তার স্বরে পৌরুষ-অভিমানের একটা আভাষ ছিল।

নারীর তখন মনে প'ড়ল—গৃহত্যাগ-কল্পনাটা তো প্রথম তারই মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল। পুরুষ সেটাকে নিজের উৎসাহে সম্ভব ক'রে তুলেছে বৈত নয়।

তাই লজ্জিত-কাতর স্বরে ব'ললে—"যেতেই হবে আমাকে। তবে আর একটু সময় চাই। আজ রাত্তির ন'টার সময় তোমায় শেষ জানাব"।

নারীর এই দ্বিধাভাবে পুরুষের দায়িত্বভারটা বাড়্ল বৈ ক'মল না।

নারী তারপর বাড়ী ফেরবার প্রস্তাব ক'রলে এবং নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। "কাল কোথায় বা বাড়ী আর কোথায় বা

কি" ? পুরুষ এই পরিহাসভাবটা আর নিবন্তে দিলে না এবং নারীর কলহাস্যে ফেরবার পথটা মুখরিত হ'য়ে উঠতে লাগল।

(৩)

সেই ফেরবার পথেই গাধার সঙ্গে দেখা।

যেখানে জিম্-নামক কুকুরটার গোর আছে সেইখানে গাধাটা দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে ছিল এক গোছা ঘাস এবং পিঠে ছিল একটি ছেলে। নারীর হাস্যরবে সে কান খাড়া ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণেই নারীকে দূরে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটল। সইস-বালকটা তার পিছনে ধাওয়া ক'রলে এবং পিঠের ছেলেটি প'ড়ে যাবার ভয়ে চর্ম্ম-বেষ্টনীটা দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রলে।

পুরুষ নারীকে আগলাবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার কিছুই দরকার ছিল না। গাধাটা নারীর কাছে এসে শান্তভাবে মাথা বাড়িয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়ালে—যেমন করে' গাধারা দাঁড়ায়।

নারী ছেলেটিকে আশ্বস্ত করে' গাধার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। ব'ললে—"এ যে সেই পেম্বা"!

এ যে তার মৃত সন্তানের চড়বার ডঙ্কি এবং খেলবার সঙ্গী ছিল। গেল বৎসর এমনি সময় রোজ দুবেলা সে পেম্বার পিঠে চ'ড়ে বেড়াত। তার সঙ্গে কথা কইত, ঝগড়া করত। কখন মারত, কখন গলা জড়িয়ে আদর করত। এই মূক প্রাণীটি সে সমস্তই নীরবে সহ্য করত এবং তার পুরস্কার স্বরূপ নারীর কাছ থেকে কখন কখন মিষ্টান্ন উপহার পেত।

এখনও তো এক বৎসর হয় নি!

নারীর চোখ জলে ভরে এল।

পুরুষ ব'ললে—"গাধারাও মনে করে রাখে" ?

নারী ব'ললে—"গাধারাই বোধ হয় মনে করে রাখে"।

পুরুষ ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে দোবার জন্যে বলতে যাচ্ছিল—"অর্থাৎ যারা মনে করে রাখে তারাই বোধ হয় গাধা"। কিন্তু সামলে গেল। নারীর চোখে তখনও জল ছিল।

তারপর সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

(৪)

চৌরাস্তার কাছে এসে গাধা নীরবে বিদায় নিলে। পুরুষও বিদায় চাওয়াতে নারীর চমক ভাঙল। ব'ললে—"অন্তত আজকের দিনটা ক্ষমা করো।"

পুরুষের মনের হাওয়াটাও ভিন্নদিকে বইতে আরম্ভ ক'রেছিল। তাই বোধ হয় ব'ললে—"একদিন নয়, চিরদিনের জন্যই ক্ষমা ক'রলুম"।

তাদের আর কালিম্পং যাওয়া হ'লনা।

বেশ বোঝা গেল পুরুষ ও নারী উভয়ের-ই মনে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রাণীটির কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সে যে-গাধা সেই-গাধাই র'য়ে গেল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।